International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-XI, December 2015, Page No. 21-28
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় রাজবংশী জাতি এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

অর্পিতশ্রী নারায়ণ
গবেষক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

In West Bengal Rajbanshi's are one of the largest caste also in Cooch Behar which is a district of West Bengal, it contributes the largest portion of the population but eventually Rajbanshi's one belonging to backward class community.

Education is only way to develop any caste community. Proper education is only way to understand 'Social System' and 'Fundamental Structure of Social System' but proper education is not only rare but very much deep rooted within the women population. Rajbanshi women caste's their votes but does not understand and why to vote or reason for the whole voting process.

But in 'Social System' political participation contributes a large part and also in democracy this bis 'Fundamental Right'. In a recent survey it has come out that 78% illiterate Rajbanshi women caste their votes but does not understand meaning and importance of voting and its impact on democracy. Through my collected data's in this topic 'Sex and Voting Turnout' 'Education and Voting Turnout', 'Sex and Active Political Participation are discussed in details in my Article'.

Key words: ***Rajbanshi, Cooch Behar, political participation***

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় রাজবংশী জাতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে রাজবংশী জাতির পরিচিতি সম্পর্কে কিছুটা জানা দরকার বলে আমার মনে হয়। রাজবংশী জাতির উদ্ভব কোত্থেকে? রাজবংশী জাতির মানুষেরা কারা? কি ই বা তাদের বংশপরিচিতি? এই সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। আর এই ধরণের কিছু প্রশ্ন মনে জেগে ওঠাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমরা বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে রাজবংশী জাতির পরিচিতি এবং উদ্ভব সম্পর্কে লেখা দেখেছি এবং যেটা বেশীর ভাগ লেখকের লেখনীতে পেয়েছি সেটি হল রাজবংশীরা ইন্দো মঙ্গোলয়েড। সুদুর তিব্বত থেকে এদের আগমন। তিব্বত হল কোচ এবং মেচদের আসল উৎপত্তিস্থল। অনেক তাত্ত্বিকরা অবশ্য মনে করেন কোচরাই হলেন বর্তমানে রাজবংশী। যদিও এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বেশ কিছু ঐতিহাসিক আবার মনে করেন কোচ জাতিই আসামে কোচ রাজবংশী নাম নিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে এরাই রাজবংশী নাম নিয়ে অবস্থান করে চলেছেন।[১] কিছুটা একই রকম মন্তব্য জ্যোতির্ময় রায়ের "রাজবংশী সমাজ দর্পন" বইটিতেও লক্ষ্য করেছি। এই বইটিতে লেখা রয়েছে "এই জনগোষ্ঠী আসামে কোচ-রাজবংশী, কোচ হিসাবে পরিচিত হলেও উত্তরবঙ্গ তথা বিহার, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ, ভূটান, নেপালে ক্ষত্রিয় রাজবংশী হিসাবেই পরিচিত।[২] কিন্তু উত্তরবঙ্গ এবং আসামে রাজবংশী এবং কোচ-রাজবংশীর মানুষের নিজস্ব ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুটা হলেও পার্থক্য দেখেছি। হয়ত ভাষাগত খানিকটা পার্থক্যের পেছনে পরিবেশ কিছুটা দায়ী।

আমার আলোচনার ক্ষেত্রটি কোচবিহারের রাজবংশী জাতির মানুষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে তা সত্ত্বেও আসামের কোচ-রাজবংশী-জাতির পরিচিতি খানিকটা না টেনে পারলাম না। কারণ রাজবংশী জাতির মানুষদের মধ্যে একটি বিশাল সংখ্যা আসামে অবস্থান করে চলেছে। একই সাথে আসামের কোচ-রাজবংশীদের প্রভাব উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের রাজবংশী জাতিদের রাজনৈতিক মনোভাবকেও আন্দোলিত করবে এটাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে "রাজনৈতিক অংশগ্রহণ" আসলে কি, সেই সম্যক ধারণাটুকুই একটি বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে অজানা। আমি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ "রাজনৈতিক অংশগ্রহণ" বলতে মনে করেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। সভায় জনসমক্ষে বক্তব্য পেশ করা, রাজনৈতিক মিটিং, মিছিলে যোগদান করা ইত্যাদিকে। তারা ভোট দানের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে ধরেনই না। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে কি বোঝায় এই প্রসঙ্গে N. Kasfir[৩] এর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাটিকে বর্ণনা করা যেতে পারে। Uganda-র রাজনীতিতে আঞ্চলিকতারাদের সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়নকালে তিনি রাজনৈতিক অংশগ্রহনের নির্ধারকগুলোকে কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা করেন, যা কিছুটা এইরূপ:[৪]

১। রাজনীতি বিষয়ে কথা বলা এবং অপরের সাথে আলোচনা করা।
২। বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশে উপস্থিত থাকা।
৩। সরকারের নিয়মানুসারে কার্যসম্পাদন করা (কর প্রদান করা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়মগুলোর পর্যবেক্ষন করা)।
৪। সরকারী দপ্তর এবং দলের সমস্যাগুলিকে বোঝা।
৫। রাজনীতিতে গৌণ ভূমিকা রয়েছে এমন একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া (ব্যবসায়ী সমিতি, সমবায় সমিতি)।
৬। ভোট দান করা।
৭। রাজনৈতিক সংগঠনের যোগ দেওয়া।
৮। রাজনৈতিক শিবিরে সময় এবং অর্থপ্রদান করা।
৯। সম্পদের বন্টনের প্রভাবিত করা বা সরকারের দ্বারা মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করা (শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রচন্ডভাবে আপত্তি প্রকাশ)।
১০। জটিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।
১১। বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের কতৃর্ত্ব গ্রহণ করা।
১২। বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় কতৃর্ত্ব গ্রহণ করা।

রাজনৈতিক অংশগ্রহন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারেরই হতে পারে। তবে নির্বাচনের সময় ভোট দানের মাধ্যমে অংশগ্রহন করা খুবই জরুরী এবং এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি বয়সের পর সমস্ত জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য শাসন প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করতে পারে। অপরদিকে নির্বাচন প্রত্যাহার করা এবং জাতীয় জনসভা থেকে বেরিয়ে আসা এই বিষয়গুলিও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে পড়ে। সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং রাজনীতির সাথে মানুষের জড়িয়ে পড়া এই বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের সঠিক অর্থ নির্দেশ করে। J. A. Schumpeter[৫] মন্তব্য করেছেন "Democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which by means of a competitive struggle for the people's vote."

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে উন্নয়ন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তেমনই আবার অনেকের মতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা। কেউ বা মনে করেন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্বতস্ফূর্তভাবে হওয়া দরকার। তবে অংশগ্রহণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে প্রান্তিক স্থান থেকে কেন্দ্রে টেনে আনতে বা স্থাপন করতে সমর্থ। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসাধারণের মধ্যে আত্মসচেতনতা গড়ে তোলা, স্বনির্ভর করা, সমর্থ বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে ব্যক্তিত্বের অর্ন্তনিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা। অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটি নাগরিক নিজেকে ভালো চিনতে পারে, বুঝতে পারে তার নিজস্ব সামর্থ্য, সচেতনতা কতখানি, বুঝতে পারে তার নিজস্ব দূর্বলতার জায়গাগুলি। স্বেচ্ছায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীর মনে নাগরিকত্ববোধের ধারণাটি আরো মজবুত হয়। ফলে নিষ্ক্রিয়তা থেকে স্বক্রিয় জায়গায় নিজেকে স্থাপন করা, উন্নয়নের প্রাপক থেকে উন্নয়নের অংশীদার হওয়া এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্টিত করার সুযোগ পায় একটি নাগরিক। ফলে সবদিক বিচার করে বলা যায়, অংশগ্রহণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানব সম্পদের বিকাশ।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল প্রচুর দেশ রয়েছে যেখানে আর্থসামাজিক ও ধর্ম, জাতিগত পার্থক্য থাকার ফলে কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণী বহু শতাব্দী ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি ভোগ করে চলেছে। ফলে প্রান্তীয় মানুষগুলি সবদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা এতটাই অন্ধকারে আবদ্ধ রয়েছে যে, নিজেদের নুন্যতম অধিকারগুলির কথা নিজেরাই জানেনা। ফলে একদিকে পৃথিবী যেমন উন্নয়নশীল থেকে উন্নত হয়ে চলেছে অপর দিকের চিত্রটি ঠিক তার উল্টো।

কোণঠাসা প্রান্তীয় মানুষগুলি নিজেদের উন্নত করার পরিবর্তে কুসংস্কার, ভীতি, অনাহার, অশিক্ষার বেরাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের কাজে অংশগ্রহণ সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। ফলেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নটিও কোনোনা কোনোভাবে অংশগ্রহণের সাথে যুক্ত। বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে ন্যায়বিচারের কথাটি মাথায় রেখে শাসক শ্রেণী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি চায়। এতে অবশ্য নিজেদের দলীয় সমর্থনও বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে, বর্তমানে ভারতে যেমন শিক্ষার হার বেড়েছে, তেমনি জনসচেতনতাও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণিগুলিও কি সবার সাথে তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে? এই প্রশ্নটি মনে বার বার জেগে ওঠে। অনগ্রসর শ্রেণির মহিলা পুরুষ উভয়েই সমানভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিনা এটিও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ সমানভাবে নাগরিকের উন্নয়নের অর্থ হল সামাজিক উন্নয়ন। একটি সমাজে নাগরিক যদি উন্নত হয় তবে সেই সমাজের সামাজিক কাঠামোটিও উন্নত হতে থাকে। যে সমাজের নাগরিক যত বেশী শিক্ষিত, সচেতন, অংশগ্রহণকারী বিচক্ষণকেই সমাজ এতটাই উন্নত।

১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা) সবচাইতে বেশী সংখ্যক তপশিলি জাতির মানুষ কোচবিহার জেলায় অবস্থিত। যেটি ১নং সারনীতে দেখাচ্ছে। যেখানে দার্জিলিং-এ মোট জনসংখ্যা ১২৯৯৯১৯ জন এরমধ্যে তপশিলি জাতির জনসংখ্যা ১৬.১৪%, জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যা ২৮০০৫৪৩ জন এরমধ্যে তপশিলি জাতির জনসংখ্যা ৩৬.৪৯%, পশ্চিম দিনাজপুর মোট জনসংখ্যা ৩১২৭৬৫৩ জন এরমধ্যে ২৯.০১% হল তপশিলি জাতির মানুষ এবং মালদায় ২৬৩৭০৩২ জন এরমধ্যে ১৮.১২% হল তপশিলি জাতির মানুষ। আর কোচবিহারে মোট জনসংখ্যা ২১৭১১৪৫ জন এরমধ্যে ৫১.৭৬% হল তপশিলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। প্রায় মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষই হল তপশিলি জাতিভুক্ত বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের তালিকাভুক্ত মানুষ।

সারনী – ১

উত্তরবঙ্গের তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনসংখ্যা

জেলা	সাল	সর্বমোট	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি	তপশিলি জাতির %	তপশিলি উপজাতির %	তপশিলির জাতি ও উপজাতির সর্বমোট %
দার্জিলিং	১৯৮১	১০২৪২৫৯	১৪৫৯৪২	১৫১০৭৩	১৪.২৫%	১৪.৭৫%	২৯%
	১৯৯১	১২৯৯৯১৯	২০৯৮৭৬	১৭৯১৫৩	১৬.১৪%	১৩.৭৮%	২৯.৯২%
জলপাইগুড়ি	১৯৮১	২২১৪৮৭১	৭৬৬৪৯৮	৪৯১৭৯১	৩৪.৬১%	২২.২০%	৫৬.৮১%
	১৯৯১	২৮০০৫৪৩	১০৩৬৯৭১	৫৮৯২২৫	৩৬.৯৯%	২১.০২%	৫৮.০২%
কোচবিহার	১৯৮১	১৭৭১৬৪৩	৮৮৩০৮৪	১০১০৫	৪৯.৮৫%	০.৫৭%	৫০.৪২%
	১৯৯১	২১৭১১৪৫	১১২৩৭১৯	১৩২৭৫	৫১.৭৬%	০.৬১%	৫২.৩২%
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৮১	২৪০৪৯৪৭	৬৮৭০৯৪	২৬১৬০০	২৮.৫৭%	১০.৮২%	৩৯.৩৯%
	১৯৯১	৩১২৭৬৫৩	৯০৭৫৫৩	২০৮৪৮৭	২৯.০১%	৬.৬৬%	৩৫.৬৭%
মালদা	১৯৮১	২০৩১৮৭১	৩৪৩০৮৯	১৫৩৩০০	১৬.৮৯%	৭.৫৪%	২৪.৪৩%
	১৯৯১	২৬৩৭০৩২	৪৭৭৮৯৬	১৭১৩২৬	১৮.১২%	৬.৪৯%	২৪.৬১%
সমগ্র উত্তরবঙ্গ	১৯৮১	৯৪৪৭৬০১	২৮২৬৭০৭	১০৫৮৮৬০	২৯.৯০%	১১.২০%	৪১.১০%
	১৯৯১	১২০৩৬২৯২	৩৭৫৫০৮৭	১১৬১৬৫৬	৩১.১৯%	৯.৬৫%	৪০.৮৪%

সূত্র : ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গের লোকগণনা।[৬]

সারনী – ২
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনসংখ্যা

জেলা	১৯৮১	১৯৯১
	রাজবংশী	রাজবংশী
দার্জিলিং	৬১৭৭০	৯৬৭৪৬
জলপাইগুড়ি	৫১৪২৭৪	৬৫৬০৭৩
কোচবিহার	৭১৪২২১	৮৬৫৬২২
পশ্চিম দিনাজপুর	৩৬৯০১৫	৪৮৯৬৪২
মালদা	৮৩৪৬২	১১৪৬৯৭
সমগ্র উত্তরবঙ্গ	১৭৪৩৬৪২	২২২২৭৭৯

সূত্র : ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা।[৭]

উক্ত দুটি সারনী যথাক্রমে সারনী ১ এবং সারনী ২ যদি আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে ১৯৯১ সালের আদমসুমারীর মানুষের সংখ্যা ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭১৯ জন। আবার সারনী ২ তে দেখা যাচ্ছে তফসিলী জাতির মানুষের মধ্যে রাজবংশী জাতির মানুষের সংখ্যা হল ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬২২ জন (১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)। অর্থাৎ এই ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭১৯ জনের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৭ জন মানুষ রাজবংশের সম্প্রদায় ভুক্ত নয়। ২০১১ সালের আদমসুমারী নথি অনুযায়ী গোটা ভারতবর্ষে যত জেলা আছে তাদের মধ্যে একমাত্র কোচবিহার হল এমন একটি জেলা যেখানে সবচাইতে বেশী সংখ্যক তপশিলি শ্রেণিভূক্ত মানুষ বাস করে। যেটি আমরা সারনী ৩ এ দেখতে পাচ্ছি।

সারনী – ৩
ভারতবর্ষে তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনসংখ্যা

জাতি	সর্বমোট	শতকরা (%)
তপশিলি জাতি	১৬৬,৬৩৫,৭০০	১৬.২%
তপশিলি উপজাতি	৮৪,৩২৬,২৪০	৮.২%

তপশিলি জাতি

সবচাইতে বেশী সংখ্যক তপশিলি জাতিভুক্ত রাজ্য	পাঞ্জাব (২৮.৯%)
সবচাইতে কম সংখ্যক তপশিলি জাতিভুক্ত রাজ্য	মিজোরাম (০.০৩%)
সবচাইতে বেশী সংখ্যক তপশিলী জাতিভুক্ত	চন্ডিগড় (১৭.৫%)
সবচাইতে কম সংখ্যক তপশিলি জাতিভুক্ত	দাদরা ও নগর হাভেলী (১.৯%)
সবচাইতে বেশী সংখ্যক তপশিলী জাতিভুক্ত	কোচবিহার (৫০.১%)
সবচাইতে কম সংখ্যক তপশিলি জাতিভুক্ত	লাউংলাই মিজোরাম (০.০১%)

সূত্র : Censusindia.gov.in>scst>dh-sc-west ...[৮]

সুতরাং কোচবিহার জেলায় রাজবংশী মানুষের একটি বিশাল সংখ্যক উপস্থিতিতে স্বীকার করে নিতেই। এই রাজবংশী মানুষদের মধ্যে অনেকেই এখনো নিজেদের প্রান্তিয় জনগোষ্ঠী বলে মনে করেন। আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি এই মানুষগুলির মধ্যে অনেকেই শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে। সমাজকে বুঝতে গেলে, জানতে গেলে, নিজেকে উন্নত করতে গেলে যেই নূন্যতম শিক্ষাটুকু দরকার, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে গেলে যে সামান্য জ্ঞানটুকু দরকার সেইটুকু কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে নেই। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মোট ৮৭ জন মহিলা এবং পুরুষের ওপর ক্ষেত্র সমীক্ষা করে সম্প্রদায়টির শতকরা হার বার করার চেষ্টা করেছি এবং সারনীগুলি তৈরী করেছি।

সারনী – ৪
লিঙ্গ ও ভোটদান

লিঙ্গ	ভোটদান			সর্বমোট
	হ্যাঁ	না	ভোটদানের কারণ জানেন না	
মহিলা	৯০.৯০%	৯.০৯%	৫৬.৮১%	৪৪
পুরুষ	৯৫.৩৪%	৪.৫৫%	২৭.৯%	৪৩

৪ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে, রাজবংশী মহিলাদের মধ্যে ৯০.৯০% ভোটদান করেছেন এবং রাজবংশী পুরুষদের মধ্যে ৯৫.৩৪% ভোটদান করেছেন। সুতরাং রাজবংশী মহিলাদের চাইতে রাজবংশী পুরুষরা সংখ্যায় বেশী ভোটদান করেছেন। আবার ভোট দিচ্ছেন অথচ কেন ভোট দেওয়া উচিত, সেই কারণটি জানেন না এমন মহিলার সংখ্যা ৫৬.৮১% যা মোট রাজবংশী জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী কিন্তু এক্ষেত্রে রাজবংশী পুরুষদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই কম অর্থাৎ ২৭.৯০%। ভোটদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল বয়স। ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, এই বিষয়টিতে যুব সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে উৎসাহী। নতুন চিন্তা, নিজস্ব মতামত প্রদান করার জায়গাটা তারা বুঝে গেছে কিছুটা হলেও। কোচবিহার রাজবংশী জাতির যুব সম্প্রদায় ১০০% ই ভোট দেয়। ক্ষেত্র সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী একটি অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ে, সেটি হল ৬৬ বছর বয়স থেকে ৭৫ বছর বয়সের সকল মানুষ ভোট দেন অথচ ৫০% শতাংশ মানুষ ভোট দানের কারণটাই জানেন না। তারা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এতটাই অচেতন যে ভোট দান করাকে তারা একটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনা। সেই তুলনায় রাজবংশী জাতির নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভোটদানের কারণ না জানার সংখ্যা অনেকটাই কম, সেটি হল ১৮.১৮%। এর থেকে ধরে নেওয়াই যায় যে রাজবংশী জাতির মধ্যে নতুন প্রজন্ম অনেকটাই এগিয়ে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সুযোগ সুবিধা, টিভি, ইন্টারনেট, এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলিকে এই প্রগতির কারণ হিসাবে ধরা যেতেই পারে।

সমাজের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলির ভালো ব্যবহার জানতে প্রয়োজন শিক্ষা। এই অত্যাধুনিক সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি না হলে অর্থাৎ যুগের সাথে যদি তাল মিলিয়ে একটি অনগ্রসর জাতি না চলতে পারে তবে তারা দিন দিন আরো অনুন্নত হতে থাকবে। কোচবিহারের রাজবংশী জাতির মানুষগুলির মধ্যে শিক্ষার সাথে ভোটদানের গুরুত্ব বোঝার বিষয়টি নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে যে তথ্য পেয়েছি সেটি কিছুটা এই রকম –

সারনী ৫
শিক্ষা এবং ভোটদান

শিক্ষা	ভোটদান			সর্বমোট
	হ্যাঁ	না	ভোটদানের কারণ জানেন না	
নিরক্ষর	৯২.৮৫%	৭.১৪%	৭৮.৫৭%	১৪
প্রাথমিক	৯১.৩০%	৮.৬৯%	৭৮.২৬%	২৩
মাধ্যমিক	৮৭.৫০%	১২.৫০%	৩১.২৫%	১৬
উচ্চমাধ্যমিক	৭৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	৪
স্নাতক	১০০.০০%	০.০০%	০.০০%	১৭
স্নাতকোত্তর	১০০.০০%	০.০০%	০.০০%	১৩

৫ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর এই বিভাগ দুটির মধ্যে ১০০% রাজবংশী মানুষই ভোট দান করেছেন এবং এই বিভাগ দুটির মধ্যে ভোটদানের কারণ জানেন না এমন একজন মানুষও নেই। এই সারনীতে আরো দেখা যাচ্ছে রাজবংশী নিরক্ষর মানুষেরা সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে অচেতনা। ভোটদানের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের এই নিরক্ষর মানুষেরা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির মানুষের ঠিক পরের স্থানেই রয়েছেন অথচ ৯২.৮৫% নিরক্ষর

রাজবংশী মানুষ ভোটদান করলেও ৭৮.৫৭% মানুষই কেন ভোট দেন সেই কারণটিই জানেনা। তারা অযথাই কিছু কারণ না জেনেই আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দের সহিত ভোট দিয়ে আসেন। সুতরাং শিক্ষা এমন বিষয় যা সব স্থানের সব জাতির মানুষের মধ্যে সমান ভাবে প্রভাব ফেলে। একই রকম ভাবে শিক্ষা কোচবিহারের রাজবংশী সমাজেও প্রভাব বিস্তার করেছে। যা রাজবংশী সমাজের মানুষদের ভোটদানের কারণ জানা বা না জানার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। সমাজের অন্যান্য জাতির সাথে সমানভাবে শিক্ষায় অগ্রসর না হলে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি ক্রমশঃ আরো পিছিয়ে পড়বে।

কেবল মাত্র ভোটদানকে আমরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলতে পারিনা। ভোটদান হল রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক পর্ব। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে আমরা কি বুঝি সেটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এবার প্রশ্ন হল সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি! ভোটদান থেকে শুরু করে মন্ত্রী সভায় মন্ত্রীদের সরকারী নীতি গ্রহণ করা, কার্য সম্পাদন করা, রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়া, পার্টির হয়ে সভায় যোগদান করা, মিছিলে যাওয়া, নির্বাচনের সময় দলের হয়ে কাজ করা, বক্তৃতা দেওয়া, পার্টির তরফ থেকে জনগণের হয়ে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা, পার্টির হয়ে নির্বাচনের স্লিপ বিলি করা - প্রাথমিক ভাবে মোটামোটি এইসব বিষয় গুলিকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কেবল মাত্র ভোটদান ছাড়াও কোচবিহারের রাজবংশী জাতি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে ঠিক কতখানি অংশগ্রহণ করেন, সেই বিষয়টি খোঁজা হয়েছে। এখানে সেটি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি সারনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সারনী – ৪
লিঙ্গ ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

লিঙ্গ	সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ			সর্বমোট
	হ্যাঁ	মোটামোটি	না	
মহিলা	১১.৩৬%	২৯.৫৪%	৫৯.০৯%	৪৪
পুরুষ	২৫.৫৮%	৪১.৮৬%	৩০.২৩%	৪৩

সারনী নং ৬ -এ দেখা যাচ্ছে ৫৯.০৯% রাজবংশী মহিলা রাজনৈতিক জীবণে সক্রিয় নন। মাত্র ১১.৩৬% মহিলা রাজনীতিতে স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে রাজবংশী পুরুষদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার হার হল ২৫.৫৮% যা রাজবংশী মহিলাদের তুলনায় প্রায় অর্ধেকেরও বেশী। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, রাজবংশী পুরুষদের চাইতে রাজবংশী মহিলার সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র অনেকটাই পিছিয়ে। ভারতের সনাতন পারিবারিক কাঠামোতে সাংসারিক বিভিন্ন কাজকর্ম করার পর এবং সন্তান সন্ততি লালন পালন করার পর রাজবংশী মহিলাদের কেবলমাত্র ভোটের দিন ভোট দেওয়া ছাড়া আর কোন ভাবেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করা বা অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বেশীর ভাগ রাজবংশী মহিলার মুখে এই একই রকম সমস্যার কথা শোনা যায়। এমনও অনেক মহিলা আছেন যারা চান সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু পারিবারিক কাজের চাপ, পারিবারিক প্রতিহিংসার দরুন তাদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। আর এই চিত্রটি শুধু যে কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মহিলাদের তাই নয়, এই চিত্র প্রায় সব জায়গার মহিলাদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় জনসংখ্যায় একটি বড় অংশ হল মহিলাদের সংখ্যা। "SR Statistical Report 2012" অনুযায়ী গোটা ভারতে ১০০০ জন পুরুষ পিছু ৯০৮ জন মহিলা এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০০০ জন পুরুষ পিছু ৯৪৪ জন মহিলা।[৯] সেখানে রাজবংশী জনসংখ্যায়ও কিছুটা এই রকম অনুপাত হারে ধরে নেওয়াই যায়। সেক্ষেত্রে যদি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের হার মাত্র ১১.৩৬% হয় তাহলে রাজবংশী মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। মূলত শিক্ষার অভাবজনীত কারণেই কোচবিহারের রাজবংশী মহিলাদের এই অবস্থা।

ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে গিয়ে দেখেছি এমন অনেক রাজবংশী নিরক্ষর মহিলা আছেন যারা নিজেরা মনে করেন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহন করছেন। পঞ্চায়েতের মিটিং-এ উপস্থিত থাকছেন, মিছিলে যাচ্ছেন, কিন্তু সভায় কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হল, কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কেনই বা তাদের সভায় ভাষণ হয়েছিল এই সব বিষয় সম্পর্কে একেবারেই অচেতন। এক্ষেত্রে আবার পুরুষরা অনেকটাই এগিয়ে অর্থাৎ সচেতন।

কিন্তু রাজবংশী জাতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়টির আলোচনায় একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাদের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ। বর্তমান সময় থেকে কিছুটা পেছনে ফিরে তাকালে লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তের সমষ্টিতে শুধুমাত্র যে বাংলা দুটি আলাদা দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল তাই নয়, সেই সময় বাংলাদেশ থেকে (পূর্ব পাকিস্তান) অগণিত মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে আসেন। বাংলাদেশে সেইসময় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের চরম অত্যাচার চলত। মুসলিম পুরুষদের দ্বারা হিন্দু বাঙালী রমণীরা ধর্ষিতা হত, ছোট ছোট শিশুদের জীবন শেষ করে কুয়োয় ফেলে দেওয়া হত, হিন্দুদের মেরে ফেলার, অত্যাচার করার, বাংলাদেশ থেকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার নেশা তখন কিছু মুসলিম মানুষদের মাথায় চড়ে বসেছিল।[১০]

হিন্দু পরিবারগুলি তখন মুসলিমদের মত পোষাক পরে, মহিলারা বোরখা পরে মুসলিম সেজে এদেশে এসেছিলেন।[১১] উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেরই অর্থ ছিল। সেই অর্থ দিয়ে তারা স্থানীয় রাজবংশীদের কাছ থেকে প্রচুর জমি কেনেন এবং বসবাস করতে শুরু করেন।[১২] বাংলা বিভক্তির ফলে রংপুর সহ আরো বিভিন্ন জায়গায় যেখানে রাজবংশীরা ব্যাপক হারে বসবাস করত সেই জায়গাগুলি বর্তমান বাংলাদেশের সীমানায় অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সেখানকার হিন্দু-রাজবংশীরাও অন্যান্য হিন্দুদের সাথে মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা, আন্দামান সহ আরো বেশ কিছু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। এই দোলাচলের মধ্যে প্রথমে করদমিত্র এবং পরে কেন্দ্রশাসিত কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পশ্চিমবঙ্গের সাথে হয়ে যায়। এর পর পর ই লক্ষ্য করা যায় উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে এবং আসামের কোচ-রাজবংশী সমাজের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে বিভিন্ন সামাজিক দল গঠন করেন এবং সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে নামেন। হিতসাধনী সভা, উত্তরখন্ড আন্দোলন, উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (UTJAS), কামতাপুর আন্দোলন, নকসালবাড়ি আন্দোলন, গ্রেটার কোচবিহার পিউপলস অ্যাসোসিয়েসনের আন্দোলন, অল আসাম কোচ রাজবংশী স্টুডেন্ট ইউনিয়নের আন্দোলন – এই সমস্ত সংগঠনগুলি উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মোটামোটি একরকম কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পন্থা হয়ত আলাদা। আসামের কোচ-রাজবংশী এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের দ্বারা গঠিত এই সংগঠনগুলিকে শুধুমাত্র সামাজিক আন্দোলন চললে ভুল হবে, বরং এদের আন্দোলনগুলিকে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যেতে পারে। কারণ রাজনৈতিক ইস্যু প্রত্যেকটি দলেই বর্তমান।

বিশেষ করে কামতাপুর রাজ্য গঠনের যে দাবি সেটি শুধুমাত্র সামাজিক আন্দোলন তা নয়। অতীতে উত্তরখন্ড দলের যে আন্দোলন ছিল সেটি প্রথম দিকে সামাজিক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তীতে কংগ্রেসের সাথে বৈরীতার সুবাদে ১৯৭২, ১৯৮২ সালে বিধান সভা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মতে কোচ-রাজবংশী অথবা রাজবংশী জাতির দীর্ঘদিনের কামতাপুর রাজ্যের আন্দোলন সমাজের মূল স্রোতের রাজনীতি থেকে তাদের খানিকটা দূরে করে রেখেছে। কোচ-রাজবংশী ও রাজবংশী জনসাধারণ নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষার দাবিতে কামতাপুর আন্দোলনে কোচবিহারের একটি বিশাল সংখ্যক রাজবংশী মানুষ যুক্ত। ফলে কোচবিহারে Main Stream Politicsএ রাজবংশী জাতির অংশগ্রহণ ঠিক কতখানি অগ্রগতি পাবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। পূর্বোক্ত সারনীতে দেখা গেছে রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে রাজবংশী জাতির শতকরা হার খুব একটা ফলপ্রসু নয়।

একটি সমাজের সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে, উন্নয়ন আনতে সমাজের নাগরিকদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনা ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে উন্নত সমাজ আরো উন্নত হতে থাকবে আর অনুন্নত সমাজ আরো অনুন্নত হয়ে যাবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে প্রয়োজন শিক্ষা, কর্মজীবণের মানোন্নয়ন, সচেতনতা, নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ, অংশগ্রহণ, ভূমিকা গ্রহণ। তবেই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। কোচবিহারের পিছিয়ে পড়া রাজবংশী সমাজের নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধির। প্রতিটি মানুষ সমাজের এক একটি খুটি। তাই সমাজের প্রতিটি খুটি মজবুত হলে তবেই একটি উন্নত মজবুত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

সূত্রনির্দেশ :

১। এই মন্তব্যটি আমি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ মহাশয়ের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় শুনেছি। ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

২। রায়, জ্যোতির্ময়, রাজবংশী সমাজদর্পন, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১২, কোলকাতা-৩২, পৃঃ- ৭।

৩। Kasfir, Nelson, *The Shrinking Political Arena: Participation and Ethnicity in African Politics with a case study of Uganda,* Berkeley University of California Press, 1976, p-6.

৪। তদেব, পৃঃ-৭

৫। Schumpeter, Joseph A, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, George Allen and Unwin, 1942, p-269.

৬। ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা।

৭। তদেব।

৮। 2001 Census Report Sc in India "Scheduled Castes and Scheduled Tribes population", censusindia.gov.in>SCST>dh-Sc-West… 25.11.15, at: 11:28 A.M.

৯। Sex Ratio in India Census 2011, www.census2011.co.in>sexratio, 3.12.15, at: 8:27 P.M.

১০। সাক্ষাৎকার, শ্রীমতি ননীবালা অধিকারী, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশের ময়মন সিংহ জেলা থেকে আগত, ২৩-২-২০১২, বনচুকুমারী, কোচবিহার।

১১। তদেব।

১২। তদেব।